وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَ
لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ
اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

سُوْرَةُ تَبَّتْ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا
كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۚ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ
يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সূরা এখলাছ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দিয়েনি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما – কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের এবাদত কর, আমি তাদের এবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের এবাদত করি তোমরা তার এবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত এবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত এবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় এবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং এবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের এবাদতপদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের এবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে-কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ — এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ — আরও এক আয়াতে لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ — এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর دين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন যার অর্থ প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তির বৈধ ও অবৈধ প্রকার ঃ আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا –অর্থাৎ, কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ আয়াতখানি। কেননা, এটা বাহ্যতঃ জেহাদের আদেশের। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তিচুক্তি নিষিদ্ধ রয়েছে وَاِنْ جَنَحُوْا আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তিচুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা

সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন— الاصلحا احل حراما اوحرم حلالا —অর্থাৎ, সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আল্লাহ্ তাআলার আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দরকষাকষির অবকাশ নেই।

সূরা নছর

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আলাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সূরা নছর বিদায় হজ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ .. আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকী থাকার সময় ... وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে। তবে সূরাটি মক্কাবিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذا جاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয়। রূহুল-মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কাবিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল-মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্বে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সাঃ)- এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কাবিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বোখারী হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। — (কুরতুবী)

وَرَاَيْتَ النَّاسَ — মক্কাবিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত শ'ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ ও এস্তেগফার করা উচিত ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ —হযরত আয়েশা বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى — (বোখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه তিনি বলতেন ঃ আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে এবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। — (কুরতুবী)

সূরা লাহাব

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ,

সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। — (ইবনে-কাসীর)

শানে-নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশে يا صباحاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত।) ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল ঃ تبالك الهذا جمعتنا ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন কোরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবু লাহাব একদিন বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর এটা হবে, সেটা হবে। পরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল ঃ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল ঃ تبالكما ماارى فيكما شيئا مما قال محمد — অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখিনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تبات এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদদোয়ার অর্থে تبت বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আবু লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وتب এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে تبا বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁরাও ওর জন্যে বদদোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদদোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - ماكسب এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা, সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه অর্থাৎ, মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ, সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। — (কুরতুবী) এ কারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে وَمَا كَسَبَ এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাআলা আবু লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এ'দুটি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আবু লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ, কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذَاتَ لَهَبٍ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ককাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে। — (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও

জুলুম বাড়িয়ে দিত।— (ইবনে-কাসীর)

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ – مَّسَدٍ শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়। — (কামুস) কেউ কেউ আরবের রীতি অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ)ও তাই তফসীর করেছেন।— (মাযহারী)

সূরা এখলাস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযুল ঃ তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।— (কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল—আল্লাহ্ তাআলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে এসে আরয করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন ঃ এই সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। — (মুসলিম, তিরমিযী) আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।—(ইবনে কাসরী)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। احد ও واحد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুওয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ – صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়। সারকথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।— (ইবনে-কাসীর)

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ — যারা আল্লাহ্র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য — স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ — অর্থাৎ, কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা এখলাস সমাপ্ত